سورة القلم

সূরা কলম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ
لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ
وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨ وَدُّوْا لَوْ
تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ
بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣
اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥
سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ
اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ
مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝١٩ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝٢٠ فَتَنَادَوْا
مُصْبِحِيْنَ ۝٢١ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝٢٢
فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝٢٣ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝٢٤
وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ۝٢٥ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۝٢٦ بَلْ
نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝٢٧ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝٢٨

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَ
لَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ط
وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ لَكُمْ
فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اَمْ لَهُمْ
شُرَكَآءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ
عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً
اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ
سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ط سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ط اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ
اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ م اِذْ نَادٰى وَهُوَ
مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ
مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ

لَمَجْنُوْنٌ ۞ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নূন---শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (২) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। (৩) আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) সত্বরই আপনি দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে। (৬) কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত। (৭) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (৮) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (৯) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, (১১) যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, যে সীমা-লংঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত; (১৪) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে ঃ সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দেব। (১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে। (১৯) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম। (২১) সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করেত চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, (২৪) অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫)) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল ঃ আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া। (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছ না কেন? (২৯) তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎ‍র্সনা করতে লাগল। (৩১) তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী। (৩২) সম্ভবত আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। (৩৩) শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত! (৩৪) মুত্তাকীদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত। (৩৫) আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর--- (৩৮) তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? (৩৯) না তোমরা আমার কাছ থেকে

কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (৪০) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন---তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল? (৪১) না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৪৪) অতএব যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আমি তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে? (৪৭) না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল। (৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। (৫০) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। (৫১) কাফিররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল। (৫২) অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নূন---(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। শপথ কলমের (যদ্দ্বারা লওহে মাহ্ফুযে সৃষ্টির ভাগ্য লিখা হয়েছে) এবং (শপথ) তাদের (ফেরেশতাদের) লিখার [যারা আমলনামা লিখে---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তফসীরই করেছেন], আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি উন্মাদ নন (যেমন কাফিররা তাই বলে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সত্য নবী। এই দাবীর পক্ষে শপথগুলো খুবই উপযুক্ত। কেননা, কোরআন অবতরণও ভাগ্যলিপির অংশ-বিশেষ। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনার নবুয়ত আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই অবধারিত। কাজেই এটা নিশ্চিত সত্য। যারা এই সত্যকে স্বীকার করে এবং যারা অস্বীকার করে, তাদের আমলনামা ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছে। সুতরাং অস্বীকারের কারণে শাস্তি হবে। এই শাস্তিকে ভয় করে ঈমান আনা ওয়াজিব)। নিশ্চয়ই আপনার জন্য (এই প্রচারকার্যের জন্য) রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (এতেও নবুয়তের উপর জোর দিয়ে শত্রুদের বিদ্রূপ উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে এবং সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কিছুকাল সবর করুন, এর পরিণাম মহাপুরস্কার লাভ)। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (আপনার প্রত্যেকটি কাজ সমতাগুণে গুণান্বিত এবং মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমণ্ডিত। উন্মাদ ব্যক্তি কি পূর্ণ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে? এটাও পূর্বোক্ত দোষারোপের জওয়াব।

অতঃপর সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে ; অর্থাৎ তারা যে বাজে প্রলাপোক্তি করে আপনি এজন্য দুঃখ করবেন না। কেননা) সত্বরই আপনি দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে যে, কে (সত্যিকার) পাগল ছিল ? (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাওয়াই পাগলামীর স্বরূপ। জ্ঞানবুদ্ধির লক্ষ্য হচ্ছে লাভ-লোকসান অনুধাবন করা এবং চিরন্তন লোকসানই প্রকৃত লোকসান। সুতরাং কিয়ামতে তারাও জানতে পারবে যে, সত্যের অনুগামীরাই বুদ্ধিমান ছিল, যারা এই লাভ অর্জন করেছে পরন্তু তারাই পাগল ছিল, যারা এই লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে চিরন্তন লোকসানকে বরণ করে নিয়েছে)। আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (তাই প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। প্রতিদান ও শাস্তির যৌক্তিকতা তখন তারাও বুঝে নেবে যখন বুদ্ধিমান ও পাগল কে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যখন আপনি সত্যের উপর ও তারা মিথ্যার উপর আছে, তখন) আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি। পরবর্তী আয়াতে তাদের আনুগত্যের বিষয়বস্তু জানা যায়। অর্থাৎ) তারা চায় যদি আপনি (নাউযুবিল্লাহ্ স্বীয় কর্তব্য কর্মে অর্থাৎ ধর্ম প্রচারে) নমনীয় হন তবে তারাও নমনীয় হবে। [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নমনীয় হওয়ার অর্থ প্রতিমাপূজার নিন্দা না করা এবং তাদের নমনীয় হওয়ার অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তফসীরই বর্ণনা করেছেন]। আপনি (বিশেষভাবে) এরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না, যে কথায় কথায় শপথ করে, (উদ্দেশ্য মিথ্যা শপথকারী। অধিকাংশ মিথ্যাবাদীই কথায় কথায় শপথ করে এবং স্বীয় কুকাণ্ডের কারণে আল্লাহ্‌র কাছে ও মানুষের কাছে) যে লাঞ্ছিত, (অন্তরে ব্যথা দেওয়ার জন্য) যে বিদ্রূপকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে ; যে ভাল কাজে বাধা দান করে, যে (সমতার) সীমালংঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। [অর্থাৎ জারজ সন্তান। সারকথা এই যে, প্রথমত মিথ্যারোপকারীদের, অতঃপর বিশেষভাবে মিথ্যারোপকারীরা যদি উপরোক্ত মন্দ বিশেষণে বিশেষিত হয়, তবে তাদের আনুগত্য করবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কতিপয় প্রধান মিথ্যারোপকারী এরূপই ছিল এবং উপরোক্ত নমনীয়তার প্রস্তাবে শরীক বরং এর উদগাতা ছিল। মোটকথা, আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না এবং তাও কেবল] এ কারণে যে, সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (অর্থাৎ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী। তার আনুগত্য করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, তার অভ্যাস হচ্ছে) যখন আমার আয়াতসমূহ তার কাছে পাঠ করা হয়, তখন সে বলে ঃ সেকালের উপকথা। (অর্থাৎ আয়াতসমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব মিথ্যারোপ করাই নিষেধ করার আসল কারণ। তবে এই নিষেধাজ্ঞাকে জোরদার করার জন্য আরও কতিপয় বদভ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এরূপ ব্যক্তির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে) আমি নাসিকা দাগিয়ে দেব (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল ও নাকের উপর কুফরের কারণে অপমান ও পরিচয়ের আলামত লাগিয়ে দেব। ফলে সে খুব লাঞ্ছিত হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর মক্কার লোকদেরকে একটি কাহিনী শুনিয়ে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আমি (মক্কার লোকদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে রেখেছি, যদ্দরুন তাদের স্পর্ধার অন্ত নেই। এতে করে আমি) তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, (যে, তারা নিয়ামতের শোকর করে ঈমান আনে, না অকৃতজ্ঞ হয়ে কুফর করে) যেমন (তাদের

পূর্বে নিয়ামত দিয়ে) পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে [হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই বাগান আবিসিনিয়ায় ছিল, সায়ীদ ইবনে যুবায়র (র) বলেন, ইয়ামেনে ছিল। মক্কাবাসীদের মধ্যে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। এই বাগানের মালিকদের পিতা তার আমলে বাগানের আমদানীর সিংহভাগ গরীব-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করত। তার মৃত্যুর পর ছেলেরা বলল ঃ আমাদের পিতা নির্বোধ ছিল। তাই আমদানীর বিরাট অংশ মিসকীনকে দান করে দিত। সম্পূর্ণ আমদানী আমাদের হাতে থাকলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত থাকবে না। সেমতে আয়াতে তাদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এই ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছিল) যখন তারা (অর্থাৎ অধিকাংশ অথবা কতক যেমন قَالَ أَوْسَطُهُمْ বলা হয়েছে) পরস্পরে শপথ করেছিল যে, তারা অবশ্যই সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে এবং (এতদূর আস্থা ছিল যে) তারা ইনশাআল্লাহ্-ও বলল না। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানের উপর এক বিপদ এসে পতিত হল (সেটা ছিল এক অগ্নি—নির্ভেজাল অথবা বায়ু মিশ্রিত) এবং তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল যেমন কর্তিত ক্ষেত। (অর্থাৎ ফসল থেকে সম্পূর্ণ খালি। কিন্তু তারা এই বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানত না)। অতঃপর সকালে (ঘুম থেকে উঠে) তারা একে অপরকে ডেকে বলল ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (ক্ষেত রূপক অর্থে বলা হয়েছে, অথবা তাতে কাণ্ডহীন উদ্ভিদ যেমন আঙুর ইত্যাদিও ছিল, অথবা বাগানের সংলগ্ন ক্ষেতও ছিল)। অতঃপর তারা পরস্পরে চুপিসারে কথা বলতে বলতে চলল যে, অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা (স্বজ্ঞানে) নিজেদেরকে না দিতে সক্ষম মনে করে যাত্রা করল (যে সব ফল বাড়ীতে নিয়ে আসবে এবং কাউকে দেবে না)। অতঃপর যখন তারা (সেখানে পৌঁছল এবং) বাগানকে (তদবস্থায়) দেখল তখন বলল ঃ নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি (এবং অন্যত্র চলে এসেছি ; কারণ এখানে তো বাগান বলতে কিছু নেই। এরপর যখন তারা চতুঃসীমা দেখে বিশ্বাস করল যে, এটাই সেই জায়গা, তখন বলল ঃ আমরা পথ ভুলিনি ;) বরং আমরা কপালপোড়া (তাই বাগানের এই দশা হয়েছে)। তাদের মধ্যে যে (কিছুটা) ভাল লোক ছিল, সে বলল ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম (যে, এরূপ নিয়ত করো না। মিসকীনদেরকে দিলে বরকত হয়। এরূপ কথা বলার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে 'ভাল লোক' বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-ও মনে মনে এটা অপছন্দ করা সত্ত্বেও সবার সাথে শরীক ছিল। তাই আমি 'কিছুটা' শব্দটি যোগ করে দিয়েছি। অতঃপর প্রথম কথা স্মরণ করিয়ে লোকটি বলল ঃ) এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছ না কেন? (যাতে পাপ মার্জনা করা হয় এবং আরও বেশী বিপদ না আসে)। তারা (তওবাস্বরূপ) বলল ঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র। (এটা তসবীহ)। নিশ্চিতই আমরা দোষী। (এটা ইস্তেগফার)। অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। (কাজ নষ্ট হলে অধিকাংশ লোকের অভ্যাস এই যে, তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে। অতঃপর তারা সবাই একমত হয়ে) বলল ঃ নিশ্চয়ই আমরা (সবাই) সীমালংঘনকারী ছিলাম। (একা কারও দোষ ছিল না। কাজেই একে অপরকে দোষারোপ করা অনর্থক। সবাই মিলে তওবা করা দরকার)। সম্ভবত (তওবার বরকতে) আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে

উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। (এখন) আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরছি [অর্থাৎ তওবা করছি। পরিবর্তে উত্তম বাগান দুনিয়াতেও হতে পারে, পরকালেও হতে পারে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, বাগানের মালিকরা মু'মিন গোনাহ্গার ছিল। এই বাগানের বিনিময়ে দুনিয়াতে তারা কোন বাগান পেয়েছিল কিনা, তা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়নি। তবে রূহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে মসউদ (রা)-এর অসমর্থিত উক্তি লিখিত আছে যে, তাদেরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দান করা হয়েছিল। অতঃপর কাহিনীর নির্যাস বর্ণনা করা হয়েছে ঃ) শাস্তি এভাবেই আসে। (অর্থাৎ হে মক্কাবাসীরা, তোমরাও এরূপ বরং এর চাইতে বেশী শাস্তির যোগ্য। কেননা এই শাস্তি ছিল গোনাহের কারণে আর তোমরা কেবল গোনাহ্গার নও---কাফিরও) পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর। যদি তারা জানত (তবে ঈমান আনত। অতঃপর কাফিরদের মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলত ঃ لَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরুদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অবাধ্যদের ন্যায় গণ্য করব? (অর্থাৎ কাফিররা মুক্তি পেলে বাধ্য ও অবাধ্যদের মধ্যে কি পার্থক্য বাকী থাকবে, যদ্দ্বারা বাধ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে? অন্য আয়াতে আছে ঃ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? তোমাদের কাছে কি কোন (ঐশী) কিতাব আছে, যাতে তোমরা পাঠ কর যে, তোমরা যা পছন্দ কর, তাই তোমরা পাবে? (অর্থাৎ এই কিতাবে লিখিত আছে যে, তোমরা পরকালে নিয়ামত পাবে)? না আমার দায়িত্বে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ লিখিত আছে (যার বিষয়বস্তু এই) যে, তোমরা তাই পাবে, যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (অর্থাৎ সওয়াব ও জান্নাত) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এ বিষয়ে কে তাদের দায়িত্বশীল? না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে, (যে তাদেরকে সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছে)? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয় (মোটকথা, এই বিষয়বস্তু কোন ঐশী কিতাবে নেই এবং অন্যান্য পন্থায়ও আমার শপথের অনুরূপ কোন ওয়াদা নেই; এমতাবস্থায় তারা কেউ অথবা তাদের কোন শরীক উপাস্য এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারে না। অতএব কিসের ভিত্তিতে দাবী করা হয়? অতঃপর কিয়ামতে তাদের লাঞ্ছনার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই দিন স্মরণীয়) সেদিন গোছার জ্যোতি প্রকাশ করা হবে এবং সিজদা করতে আহ্বান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এর ঘটনা এরূপ বর্ণিত আছে ঃ কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় গোছা প্রকাশ করবেন। এটা আল্লাহ্র বিশেষ কোন গুণ, যাকে কোন মিলের কারণে গোছা বলা হয়েছে। কোরআনে এর অনুরূপ আল্লাহ্র হাতের কথা আছে। এগুলোকে متشابهات রূপে অভিহিত করা হয়। এই হাদীসেই আছে, এই তাজাল্লী দেখে মু'মিন নর-নারী সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লোক দেখানো সিজদা করত, তার কোমর তক্তার ন্যায় সোজা থেকে যাবে—সে সিজদা করতে সক্ষম হবে না।

এখানে সিজদা করতে আহ্‌বান জানানোর অর্থ সিজদার আদেশ করা নয়; বরং এই তাজাল্লীর প্রভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সিজদা করতে চাইবে। তাদের মধ্যে মু'মিনগণ তা করতে সক্ষম হবে এবং লোক দেখানো ইবাদতকারীরা ও কপট বিশ্বাসীরা সক্ষম হবে না। সুতরাং কাফি-ররা যে সক্ষম হবে না, তা বলাই বাহুল্য। কাফিররাও সিজদা করতে চাইবে। অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি (লজ্জাবশত) অবনত থাকবে এবং তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে। (এর কারণ এই যে) তারা (দুনিয়াতে) যখন সহী সালামতে ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্‌বান জানানো হত। [অর্থাৎ ঈমান এনে ইবাদত করতে বলা হত। ঈমান ও ইবাদত ইচ্ছাধীন কাজ। দুনিয়াতে এই আদেশ পালন না করার কারণে আজ কিয়ামতে তাদের এই লাঞ্ছনা হয়েছে। অন্য আয়াতে দৃষ্টি উপরে উত্থিত থাকার কথা আছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, মাঝে মাঝে বিস্ময়ের আতিশয্যে দৃষ্টি উপরে থাকবে এবং মাঝে মাঝে লজ্জার আতিশয্যে দৃষ্টি অবনত থাকবে। আযাবে বিলম্বকে কাফিররা তাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ মনে করত। অতঃপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উপরের আয়াত থেকে যখন জানা গেল যে, তারা আযাবের যোগ্য, তখন] যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ আযাবের বিলম্ব দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না)। আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাচ্ছি, তারা টেরও পায় না। আমি (দুনিয়াতে তাদেরকে আযাব না দিয়ে) তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল বলিষ্ঠ। (অতঃপর তারা যে নবুয়ত অস্বীকার করে, সেজন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে) আপনি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপেছে (তাই আপনার আনুগত্য করতে চাইছে না)। না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে, অতঃপর তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) লিপিবদ্ধ করছে? (অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অন্য কোন পন্থায় জেনে নেয়, যদ্দরুন পয়গম্ব-রের মুখাপেক্ষী নয়। বলা বাহুল্য উভয় বিষয় নেই। এমতাবস্থায় নবুয়ত অস্বীকার করা বিস্ময়কর ব্যাপার। অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। যখন জানা গেল যে, তারা কাফির, আযাবের যোগ্য এবং ঢিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সময় দেওয়া হচ্ছে। প্রতিশ্রুত সময়ে অবশ্যই আযাব হবে, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং (বিষণ্ন মনে) মাছওয়ালা (ইউনুস পয়গম্বর)-এর মত হবেন না [যে আযাব নাযিল না হওয়ার কারণে বিষণ্ন মনে কোথাও চলে গিয়েছিল। একাধিক জায়গায় এই ঘটনা আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ইউনুস (আ)-এর সাথে তুলনায় বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। এখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ সেই সময়টি স্মরণীয়] যখন ইউনুস (আ) দুঃখাকুল মনে দোয়া করেছিল। [এই দুঃখ ছিল একাধিক দুঃখের সমষ্টি---এক. সম্প্রদায়ের ঈমান না আনার, দুই. আযাব টলে যাওয়ার, তিন. আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তরে গমন করার, এবং চার. মাছের পেটে আবদ্ধ হওয়ার। দোয়া ছিল এইঃ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ---এর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমা ও আটকাবস্থা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করা। সে মতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইউনুস (আ) মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ করেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে (যে প্রান্তরে মাছের পেটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই) জনশূন্য প্রান্তরে নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হত। (সামাল দেওয়ার অর্থ তওবা কবূল করা এবং নিন্দিত অবস্থার অর্থ তার ইজতিহাদী ভুলের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে নিন্দিত হয়েছিল। এই আয়াত এবং সূরা সাফফাতের আয়াতের সারমর্ম এই যে, তওবা কবূল না হলে মাছের পেট থেকে মুক্তি সম্ভবপর ছিল না। যদি তওবা করত এবং আল্লাহ্ তা'আলা কবূল না করতেন, তবে তওবার পার্থিব বরকতস্বরূপ মাছের পেট থেকে মুক্তি তো হয়ে যেত, কিন্তু প্রান্তরে যে ভাবে পূর্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, মুক্তির পরও সেভাবে নিক্ষিপ্ত হত এবং তা নিন্দিত অবস্থায় হত। কিন্তু এখন নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়নি। কারণ তওবা কবূলের পর ভুলের কারণে নিন্দা করা হয় না)। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে (আরও বেশি) মনোনীত করলেন এবং তাকে (অধিক) সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। [পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করার কারণে ইউনুসের ক্ষতি হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার কারণে উপকার হয়েছে। অতএব, আযাবের ব্যাপারে আপনিও নিজের মতানুসারে তাড়াহুড়া করবেন না; বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। এর পরিণাম শুভ হবে। কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাগল বলত। সূরার শুরুতে এক ভঙ্গিতে তা খণ্ডন করা হয়েছে। এখন ভিন্ন ভঙ্গিতে তা খণ্ডন করা হচ্ছেঃ] কাফিররা যখন কোর-আন শুনে, তখন (শত্রুতার আতিশয্যে) এমন মনে হয় যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে (এটা একটা বিশেষ বাকপদ্ধতি, যেমন বলা হয়ঃ অমুক ব্যক্তি এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন খেয়ে ফেলবে। রূহুল মা'আনীতে আছেঃ نظر الى نظر يكاد يصد عنى او يكاد ياكلنى উদ্দেশ্য এই যে, ক্রোধের আতিশয্যে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনিষ্টের দৃষ্টিতে দেখে এবং (শত্রুতাবশত তাঁর সম্পর্কে) তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ এই কোরআন তো (যা আপনি পাঠ করেন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (পাগল ব্যক্তি এমন ব্যাপক উপদেশের কথাবার্তা বলতে পারে না। এতে তাদের দোষারো-পের জওয়াব হয়ে গেছে। শত্রুতাবশত বলে এ কথাটি যুক্ত হওয়ার কারণেও প্রমাণিত হয় যে, তাদের দোষারোপের ভিত্তি দুর্বল। কেননা, শত্রুতার আতিশয্যে যে কথা বলা হয়, তা ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মূলকে সৃষ্ট জগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা

আল্লাহ্ প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণ জ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত রসূলকে (নাউযুবিল্লাহ্) উন্মাদ ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই গোটা ব্যাপারটি কাফিরদের জ্ঞানও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল। তাই তারা একে পাগলামি আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাধনার যোগ্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্য দর্শীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ — নূন অক্ষরটি একটি খণ্ড বর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের খণ্ড বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

কলমের অর্থ এবং কলমের ফযীলত ঃ এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কলম দাখিল আছে। এখানে বিশেষত ভাগ্যলিপির কলমও বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কলম সম্পর্কে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরয করল ঃ কি লিখব? তখন আল্লাহ্র তকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ কলম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লেখে এবং লেখবে। সূরা ইকরার عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতে এই কলমের উল্লেখ আছে।

আয়াতে কলম বলে যদি সর্বপ্রথম সৃষ্টি তকদীরের কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কাজেই এর শপথ করা উপযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তকদীরের কলম, ফেরেশতাদের কলম ও মানুষের কলমসহ সাধারণ কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর শপথ করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাজ কলমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দেশ বিজয়ে তরবারির চাইতে কলম যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার, এ কথা সর্বজন-বিদিত। আবু হাতেম বস্তী (র) এই বিষয়বস্তুই দুটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

اذا اقسم الابطال يوما بسيفهم
وعدوه مما يكسب المجد والكرم
كفى قلم الكتاب عزا ورفعة
مدى الدهر ان الله اقسم بالقلم

অর্থাৎ যদি বীর পুরুষরা কোনদিন তাদের তরবারির শপথ করে এবং একে সম্মান ও গৌরবের কারণ মনে করে, তবে লেখকদের কলম ও তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরতরে বৃদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কলমের শপথ করেছেন।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন ঃ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন।

এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলিমগণ বলেন ঃ কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে مَا يَسْطُرُونَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লেখা হয়েছে এবং লেখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ — অর্থাৎ আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামি বলছে, সেটা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না--চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্য পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ—এতে রসূলে করীম (সা)-র উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উম্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহৎ চরিত্র ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ স্বয়ং কোরআন রসূলে করীম (সা)-এর মহৎ চরিত্র অর্থাৎ কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (সা)-এর সত্তায় আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণ মাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ بعثت لاتمم مكارم الاخلاق অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।---(আবূ হাইয়ান)

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি সুদীর্ঘ দশ বছরকাল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি যেসব কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি কখনও বলেন নি যে, কাজটি এভাবে কেন করলে, অমুক কাজটি করলে না কেন? অথচ দশ বছর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তাঁর রুচি বিরুদ্ধও হয়ে থাকবে।---(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন ঃ তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা কি বলব, মদীনার কোন বাঁদীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।---(বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও স্বহস্তে কাউকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের ময়দানে কাফিরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রমাণিত আছে। এছাড়া তিনি কোন খাদিমকে অথবা স্ত্রীকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কারও কোন ভুলভ্রান্তি হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ আল্লাহ্র আদেশ লংঘন করলে তাকে শরীয়তসম্মত শাস্তি দিয়েছেন।---(মুসলিম)

হযরত জাবের (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সওয়ালের জওয়াবে কখনও 'না' বলেন নি। ----(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যেতেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল করতেন না এবং মন্দ ব্যবহারের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দিতেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ রসূলে করীম (সা)-এর উক্তি এই যে, আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় উত্তম চরিত্রের সমান

কোন আমলের ওজন হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা গালিগালাজকারী মন্দভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

হযরত আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মুসলমান তার সচ্চরিত্রতার গুণ দ্বারাই সেই ব্যক্তির মর্তবা লাভ করে, যে সারা রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকে এবং সারাদিন রোযা রাখে।---(আবু দাউদ)

হযরত মা'আয (রা) বলেনঃ (আমাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময়) ঘোড়ার জিনের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটিতে যখন আমি এক পা রাখলাম তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বললেনঃ

يا معاذ أحسن خلقك للناس---হে মা'আয, জনগণের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করবে।---(মালেক)

এসব রেওয়ায়েত তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হল।

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ---শীঘ্রই আপনিও দেখে নেবেন এবং কাফিররাও দেখে নেবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مفتون শব্দের অর্থ এ স্থলে বিকারগ্রস্ত---পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসূলে করীম (সা)-এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ - وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ---অর্থাৎ আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমাপূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে। ---(কুরতুবী)

মাস'আলাঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিছু বলব না, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না'---কাফির ও পাপাচারীদের সাথে এই মর্মে কোন চুক্তি করা দীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের নামান্তর ও হারাম।---(মাযহারী) অর্থাৎ বেগতিক না হলে এরূপ চুক্তি না-জায়েয।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ - —আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎ কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زنيم শব্দের অর্থ পিতৃ-পরিচয়হীন ---জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন-রূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফির ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দেব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خرطوم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خرطوم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ—অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াত-সমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি মক্কাবাসী কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকেও নিয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত তো এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নিয়ামত মক্কাবাসীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ্ দেখতে চান যে, তারা এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই আয়াতগুলোকে মক্কায় অবতীর্ণ মনে করা হলেও এই তফসীর সঠিক। কিন্তু অনেক তফসীরবিদ এই আয়াতগুলোকে

মদীনায় অবতীর্ণ মনে করেন এবং আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুর্ভিক্ষের আযাব, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীর উপর আপতিত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় মৃত জন্তু ও বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা হিজরতের পরবর্তী ঘটনা।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে যুবায়র-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল---(ইবনে কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে-কিতাব। ঈসা (আ)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে।--(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে 'আসহাবুল-জান্নাত' তথা উদ্যানওয়ালা নামে অভিহিত করা হয়েছে।. কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় যে, তাদের মালিকানাধীন কেবল উদ্যানই ছিল না, চাষাবাদের ক্ষেতও ছিল। তবে উদ্যানের প্রসিদ্ধির কারণে উদ্যানওয়ালা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে মারওয়ানের বাচনিক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এই ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

ইয়ামনের 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে ছরওয়ান নামক একটি উদ্যান ছিল। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্যশস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নিচে পড়ে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল ঃ আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল। তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্য রেখে দিত। অতএব আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ —অর্থাৎ তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল-সকালই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং পেছনে পেছনে না চলে। এই পরিকল্পনার

প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, 'ইনশাআল্লাহ্' বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় 'ইনশআল্লাহ্ আগামীকাল এ কাজ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ لَا يَسْتَثْنُوْنَ-এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দেব না।---(মাযহারী)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ---অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে এক বিপদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَائِمُوْنَ---অর্থাৎ এই আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন।

كَالصَّرِيْمِ---صرم শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صريم---এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেইরূপ করে দিল। صريم-এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল। ---(মাযহারী)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ---অর্থাৎ তারা অতি প্রত্যূষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল ঃ যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল সকালই ক্ষেতে চল। وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

حرد---وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগ, গোসা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দেবে।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ---যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ক্ষেত-বাগান

কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছে ; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ بل نحن محرومون —আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون —তাদের মধ্যে যে মাঝারি ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করনা কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দেবেন না, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে পবিত্র। যারা তার পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিয়ে দেন।—(মাযহারী)

قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين —তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল ত্রুটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালিম। কারণ, তারা ফকীর-মিসকীনের আংশও হজম করতে চেয়েছিল।

এই মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون —অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আযাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না ; বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকাল এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوْا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ—অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহ্গার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকারোক্তি তওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন।

ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেনঃ আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক-একটি আঙুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত।—(মাযহারী)

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ—মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র আযাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ার এই আযাব আসার পরও তাদের পরকালের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে সৎ আল্লাহ্ভীরুদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে মক্কার মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা দাবী করত যে, প্রথমত কিয়ামত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের কাহিনী উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত যদি এরূপ হয়েও যায়, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার ন্যায় নিয়ামত ও অগাধ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। কয়েক আয়াতে এই দাবীর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও অপরাধীদেরকে সমান করে দেবেন—এ কেমন উদ্ভট ও অভিনব সিদ্ধান্ত! এর পক্ষে না আছে কোন প্রমাণ, না আছে ঐশী কিতাব থেকে কোন সাক্ষ্য এবং না আছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা। এমতাবস্থায় কেমন করে এরূপ দাবী করা হয়?

কিয়ামতের একটি যুক্তিঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং সৎ-অসতের প্রতিদান ও শাস্তি হওয়া যুক্তিগতভাবে অবশ্যম্ভাবী। কেননা, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে সাধারণত যারা পাপাচারী, কুকর্মী, চোর-ডাকাত, তারাই সুখে থাকে এবং মজা লুটে। একজন চোর ও ডাকাত মাঝে মাঝে এক রাত্রিতে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন ভদ্র ও সাধু ব্যক্তি সারা জীবনেও উপার্জন করতে পারে না। তদুপরি সে আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় কাকে বলে, জানে না এবং কোন লজ্জা-শরমের বাধাও মানে না; যে-ভাবে ইচ্ছা মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে যায়। পক্ষান্তরে সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি প্রথমত আল্লাহ্কে ভয় করে, যদি তাও না থাকে, তবে সামাজিক লজ্জা ও শরমের চাপে দমিত

হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, দুনিয়ার কারখানায় দুষ্কর্মী ও বদমায়েশেরা সফল এবং সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি ব্যর্থ মনোরথ দৃষ্টিগোচর হয়। এখন সামনেও যদি এমন সময় না আসে যাতে সৎ ব্যক্তি উত্তম পুরস্কার পায় এবং অসাধু ব্যক্তি শাস্তি লাভ করে, তবে প্রথমত কোন মন্দকে মন্দ এবং গোনাহ্কে গোনাহ্ বলা অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ এতে একজন মানুষকে অহেতুক তার কামনা থেকে বিরত রাখা হয়; দ্বিতীয়ত ন্যায় ও সুবিচারের কোন অর্থ থাকে না। যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা এই প্রশ্নের কি জওয়াব দেবে যে, আল্লাহ্র ইনসাফ কোথায় গেল ?

দুনিয়াতে প্রায়ই অপরাধী ধরা পড়ে, লাঞ্ছিত হয় এবং সাজা ভোগ করে। এতে করে সৎ লোকের স্বাতন্ত্র্য দুনিয়াতেই ফুটে উঠে। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কিয়ামতের প্রয়োজন কি ? উপরোক্ত বক্তব্যে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেননা, প্রথমত সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রের দেখা শুনা সম্ভবপর নয়। যেখানে অপরাধী ধরা পড়ে, সেখানেও আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি সর্বত্র সংগৃহীত হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেলেও ঘুষ, সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির অনেক চোর দরজা দিয়ে অপরাধী নাগালের বাইরে চলে যায়। বর্তমান যুগে প্রচলিত আইন-আদালতের অপরাধ ও শাস্তি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এ যুগে কেবল সেসব বেওকুফ, নির্বোধ ও অসহায় ব্যক্তি শাস্তি পায়, যারা চালাকী করে কোন চোর দরজা বের করতে পারে না এবং যার কাছে ঘুষের টাকা নেই বা কোন বড় লোক সুপারিশকারী নেই অথবা যে নির্বুদ্ধিতার কারণে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া সব অপরাধীই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করে।

কোরআন পাকের أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ বাক্যটি এই সত্য ফুটিয়ে তুলেছে যে, যুক্তিগতভাবে এরূপ সময় আসা জরুরী যেখানে সবার হিসাব-নিকাশ হবে, যেখানে অপরাধীদের জন্য কোন চোর-দরজা থাকবে না, যেখানে ইনসাফই ইনসাফ হবে এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে। এটা না হলে দুনিয়াতে কোন মন্দ কাজ মন্দ নয়, কোন অপরাধ অপরাধ নয় এবং আল্লাহ্র ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কোন অর্থ থাকে না।

যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন ও ক্রিয়া কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি নিশ্চিত, তখন অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ অবস্থা ও অপরাধীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন كشف ساق অর্থাৎ গোছা উন্মোচিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ—অর্থাৎ যারা কিয়ামতের কথা অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে 'ছেড়ে দিন' কথাটি একটি বাক পদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র

উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে বারবার এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এসব বেদনাদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে ঃ আমার রহস্য আমিই ভাল জানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দিই; তাৎক্ষণিক আযাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনার জন্য অবকাশও হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ) কাফিরদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে আযাবের দোয়া করেছিলেন। আযাবের আলামত সামনেও এসে গিয়েছিল এবং ইউনুস (আ) আযাবের জায়গা থেকে অন্যত্র সরেও গিয়েছিলেন; কিন্তু এরপর সমগ্র সম্প্রদায় কাকুতি-মিনতি ও আন্তরিকতা সহকারে তওবা করেছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে আযাব সরিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর ইউনুস (আ) সম্প্রদায়ের কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন না করার পথ বেছে নেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্য সামুদ্রিক ভ্রমণে মাছের পেটে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটান। অতঃপর ইউনুস (আ) হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন। সূরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবীর কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি দ্রুত আযাব প্রেরণের আকাঙ্ক্ষাও করবেন না। আমার নিগূঢ় রহস্য এবং বিশ্ববাসীর যথার্থ উপযোগিতা আমিই সম্যক জানি। আমার উপর ভরসা করুন।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ—এখানে হযরত ইউনুস (আ)-কে صاحب حوت 'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

وَاِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ—يزلقون শব্দটি ازلاق থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হোচট দেওয়া, ভূপাতিত করা।---(রাগিব)

উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলে ঃ এ তো পাগল। وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ—অথচ এই কালাম বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ

কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফিরদের যে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের হিফাযত করলেন। ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন: নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।—(মাযহারী)